গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১৯ - ২৫ মার্চ, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

১৪ মার্চ কার্ল মার্কস স্মরণ দিবসে কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসের শতবর্ষে দিল্লিতে মহিলা সমাবেশ

কোনও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী সংরক্ষণ দাবি করতে পারে না — নেতৃবৃন্দ

যথার্থ নারীমুক্তির আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য ৮ মার্চ মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্যসভায় যখন সরকারপক্ষ ও তথাকথিত বিরোধীদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল চলছে, সেই সময় যথার্থ নারীমুক্তির পথের দিশা নিয়ে নারীসমাজের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি তুলে ধরে দিল্লির বুকে বিশাল মিছিল ও পার্লামেন্ট স্ট্রিটে সমাবেশ করল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্রে মূল্যবৃদ্ধি, নারীনির্যাতন, অশ্লীলতা, মদের প্রসার রোধ এবং মহিলাদের শিক্ষা, চাকুরি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানায় এ আই এম এস এস।

পার্লামেন্ট স্ট্রিটের বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, 'পার্লামেন্টে আসন সংরক্ষণ নারীজীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না। নারী নির্যাতন, নারী নিগ্রহ বাড়ছে, মহিলারা শিক্ষা-চাকুরি ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মদের প্রসার বাড়ছে, গণমাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসার মাত্রাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সরকার কোনও ভূমিকাই নিচ্ছে না। মহিলাদের বিভ্রান্ত করতে একটা মিথ্যা আশা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে যে, সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই মহিলাদের ক্ষমতায়ন হবে এবং তাদের জীবনের সমস্যা মিটবে। আমাদের সংগঠনের দৃঢ় অভিমত যে, সংরক্ষণ এবং সমানাধিকারের দাবি পরস্পর বিরোধী, ফলে এ দু'টি একই সাথে হাত ধরে আসতে পারে না। গণতন্ত্র নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথাই বলে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ গণতন্ত্রের মূল সুরের বিরোধী। এটা নারীর সম্মান ও মর্যাদার পক্ষেও হানিকর। কোনও মর্যাদাসম্পন্ন নারী মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ দাবি করতে পারেন না।'

৮ মার্চ দিল্লিতে মহিলাদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংসদ ভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে

এদিনের সমাবেশে মূল অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। তিনি বলেন, মহিলারা এখন পর্যন্ত যতটুকু অধিকার অর্জন করেছেন তা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। ছয় বছর আগে এ আই এম এস এস দিল্লিতে এই পার্লামেন্ট স্ট্রিটে একটি প্রতিবাদ সভা করেছিল। সেই সময় সুপ্রিম কোর্ট সূর্যাস্তের পর এবং মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে বলে যে রায় দিয়েছিল, তার প্রতিবাদেই ছিল ঐ সমাবেশ। সেই আন্দোলন সফল হয়েছে। এই সংগ্রামই হচ্ছে অধিকার অর্জনের একমাত্র রাস্তা এবং নারীদিবসের বার্তাও সেটাই। সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল।

আটের পাতায় দেখুন

নিউক্লিয়ার ড্যামেজ বিল বাতিলের দাবি জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বিদেশি, বিশেষত মার্কিন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবিত 'সিভিল লায়াবিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ বিল' নামক সর্বনাশা বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থাগুলির কোনও আইনি দায়বদ্ধতা থাকবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারতের অথবা সংস্থাগুলির নিজেদের দেশের আদালতে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাবে না। দুর্ঘটনা ঘটলে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত রিঅ্যাকটর-অপারেটর 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' (এন পি সি আই এল)-এর দায়বদ্ধতার পরিমাণ হবে সর্বাধিক মাত্র ৫০০ কোটি টাকা (১০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার)। বিদেশি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে এন পি সি আই এল ওই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে

চারের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রামের সংগ্রাম অবিস্মরণীয়

১৪ মার্চ। ২০০৭ সালের এই দিনটিতেই কেমিকেল হাব গড়ার জন্য বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে ১৪ হাজার একর কৃষি ও বাস্তু জমি তুলে দিতে সিপিএম সরকারের সশস্ত্র পুলিশ ও দলীয় খুনি বাহিনী নিদারুণ হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নন্দীগ্রামের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর। জানুয়ারি থেকেই দলীয় খুনি বাহিনী দিয়ে আক্রমণ হানার প্রক্রিয়াতেই শেষ পর্যন্ত জমির দখল নিতে মরিয়া সরকার এই ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ চালিয়েছিল। এ ঘটনা নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর একটি নির্বাচিত সরকারের পুলিশ ও দলীয় খুনি বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণের কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু সরকারি এই আক্রমণকে ম্লান করে দিয়ে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম। নন্দীগ্রামের চাষি-মজুরের এই ঐতিহাসিক গণপ্রতিরোধ আন্দোলন শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এই সংগ্রাম থেকে প্রেরণা নিয়েই মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কেমিকেল হাব এবং এস ই জেড প্রতিরোধে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, এবং আজও তা সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। সিপিএমের হাতে লাল ঝান্ডা, আর মুখে মার্কসবাদের স্লোগান দেখে ওদের 'মার্কসবাদী' বলে মনে করা যে কত বড় ভুল, ওরা যে কোনদিনই মার্কসবাদী ছিল না, তা নন্দীগ্রাম আন্দোলন নতুন করে প্রমাণ করেছে। এই আন্দোলন চিনিয়ে দিয়েছে, সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির একই চরিত্র। দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষায়, গণআন্দোলনের ওপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধ্বংস করায় তাদের একই ভূমিকা।

আটের পাতায় দেখুন

১৪ মার্চ, ২০১০। নন্দীগ্রামের গোকুলনগরের অধিকারীপাড়ায় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে স্থায়ী শহিদবেদিতে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে (ঠিক যে সময়ে ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ গুলি চলেছিল) মাল্যদান করে সংগ্রামী অভিবাদন জানাচ্ছেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। পাশে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও সাংসদ শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কমিটির অন্যতম নেতা ভবানীপ্রসাদ দাস। তাঁরাও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কে কমরেড তরুণ মণ্ডল

রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আমি শুরু করতে চাই তাঁর ভাষণের একেবারে শেষ অংশ থেকে। সেখানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্য রাতের একটি বক্তব্যের অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। নেহেরু বলেছিলেন, 'ভারতের সেবা করা মানে লক্ষ কোটি দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সেবা করা। এর অর্থ দারিদ্র, অশিক্ষা এবং রোগজীর্ণতা ও সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানো।' জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন, স্বাধীনতার ৬২ বছরে, যার মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের শাসনকালই অর্ধশতাব্দীর বেশি, এই স্বপ্ন ও লক্ষ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে? অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, গোটা বিশ্বে অপুষ্টিতে ভোগা মোট শিশুদের এক-তৃতীয়াংশই আমাদের দেশে বাস করে। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে। আমাদের দেশেই যক্ষা, কুষ্ঠ ও ফাইলেরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবুও বিশ্বের স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে কম ব্যয় করে যে পাঁচটি দেশ, ভারত তাদের অন্যতম। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত মহিলারা অশিক্ষা ও নিরক্ষরতায় বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে। এদেশের গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য নয়, ধনীদের দ্বারা এবং ধনীদের জন্য। বিশেষত বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণের পরিণামে দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ৭৭ শতাংশ জনগণ দৈনিক কুড়ি টাকারও কম রোজগার করে। দেশের ২৫ শতাংশ নাগরিক রোজ রাতে শুতে যায় ক্ষুধা নিয়ে। এই পটভূমিতে ৭.৫৫ শতাংশ আর্থিক অগ্রগতির কথা বলা দেশের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কর্মহীন, রোগজর্জরিত কোটি কোটি জনগণের প্রতি অসম্মান ছাড়া আর কী হতে পারে?

জঙ্গলমহল প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলমহলে সিপিএমের পরিকল্পনা মতো যৌথবাহিনী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করছে, যাতে সিপিএম আদিবাসী অঞ্চলে তার হৃত জমি পুনরায় ফিরে পায়। সেখানে সরকার জনগণের খাদ্য, রাস্তা, শিক্ষা, চাকরি, পানীয় জল ও উন্নয়নের দাবির জবাব দিচ্ছে গুলি ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মাওবাদী তকমা দিয়ে ইউ এ পি এ-র মতো কালাকানুন প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু শক্তি ও বন্দুক দেখিয়ে ওখানকার জনঅসন্তোষের সমাধান করা যাবে না। আন্দোলনকারী জনগণের সঙ্গে কার্যকরী আলোচনার দ্বারাই একমাত্র সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে।

আয়লা

যদিও পশ্চিমবঙ্গে গত বছর ঘটে যাওয়া আয়লা ঘূর্ণিঝড়কে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী এখনও পায়নি। সিপিএম সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো ভঙ্গুর বাঁধগুলির যথাযথ মেরামত হয়নি। দলবাজি ও দুর্নীতির ফলে কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে। আয়লায় দুর্গত মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ভারতনির্মাণ

ভারতনির্মাণ তথা ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি বলে যা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার পঞ্চাশ শতাংশ মাত্র কাজ হয়েছে। স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও দেশের ৬২ শতাংশ কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি। দেশের মোট এক-তৃতীয়াংশ গ্রামে আজও পানীয় জলের সরবরাহ নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ এখনও দিবাস্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গ সহ অধিকাংশ রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পটি যথেষ্ট নাম করেছে।

মূল্যবৃদ্ধি

খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। দেশে রেশন ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। গোটা দেশে একজনও মজুতদার ও কালোবাজারিকে ধরা হয়নি এবং শাস্তি দেওয়া হয়নি। উৎপাদন যদি কম হয় জনগণও তা কম পরিমাণে পাবে, তার জন্য তাদের বেশি দাম দিতে হবে কেন? নির্দিষ্ট ও ন্যায্য মূল্য কেন স্থির করে দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র অসাধু ব্যবসায়ীদের পকেট ভরানোর জন্যই সরকার জনগণের উপর তাদের শোষণ মাত্রাছাড়া করার ব্যবস্থা করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ছাড়া পণ্যের দাম আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় না। এই অবস্থায় সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম আরও বাড়ালে দেশের মানুষের উপর তা বৃহত্তর বোঝা হিসাবে চাপবে।

শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থা ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ডেকে আনার পরিকল্পনা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। বর্তমানে সরকারি শিক্ষানীতির মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ। যেভাবে সমস্ত কাউন্সিল ও ডাইরেক্টরেটগুলিকে ভেঙে দিয়ে ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ নামে একটি সংস্থা তৈরি করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ন্যাশনাল রুরাল হেল্থ মিশন, অডিট হিসাব অনুযায়ী, একটা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাস্তবে এই হেলথ মিশনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রচলিত স্বাস্থ্যব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসার স্বার্থরক্ষা, একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্যকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে তিন বছরের মেডিকেল শিক্ষার যে কোর্স চালু করতে চাইছে, তা একদিকে অসাংবিধানিক, অন্যদিকে তা গ্রামীণ জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করার দৃষ্টান্ত। এই স্কিম অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। আমাদের দেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতে হলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে হবে, স্বাস্থ্য বাজেট বাড়াতে হবে।

টাকা দিয়ে খবর তৈরি করা

যে সব রাজনৈতিক দলগুলির এবং প্রার্থীদের প্রচুর অর্থ আছে, তারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিজেদের স্বার্থে পছন্দ মতো খবর তৈরি করে প্রচার করাচ্ছে। এই চূড়ান্ত অনৈতিক কাজের দ্বারা সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক চরিত্রকেই ধ্বংস করা হচ্ছে, জনগণকেও মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এ জিনিস অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

আসামে নাগরিকত্ব হরণ

বর্তমানে সমগ্র দেশে নাগরিকদের একটি 'পরিচয় নম্বর' দেওয়ার যে আইন করা হয়েছে আসামের ক্ষেত্রে তাকে বিকৃত করা হচ্ছে। ঐ রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের উপরই নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় চাপিয়ে দিয়ে প্রথমত নাগরিকত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, নানা অজুহাত তুলে তাদের 'বাংলাদেশি' বানিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকারই কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি প্রশাসনের এই বৈষম্যমূলক আচরণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

প্রবীণ পার্টি সংগঠক কমরেড সুধীর পালের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য কমরেড সুধীর পাল গত ২০ ফেব্রুয়ারি, মেচেদার পপুলার নার্সিং হোমে রাত ৮টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যার সাথে হার্টের ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যায় তিনি ভুগছিলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যু সংবাদে তিনি গভীর আঘাত পান। ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে তাঁর কষ্ট হঠাৎ খুব বেড়ে যায় এবং তাঁকে কোলাঘাটের বাসস্থান থেকে মেচেদায় পপুলার নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ হয় এবং চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে রাত্রি ৮টায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই হাসপাতালে চলে যান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা ও মেচেদার পার্টিকর্মীরা। কমরেড সুধীর পালের ছেলে আনন্দ পাল ও আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে চলে আসেন। কমরেড সুধীর পালের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের কিছু দিক তুলে ধরে বক্তব্য রেখে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড মানব বেরা।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় মেচেদায় দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির কার্যালয়ে। সেখানেও কমরেড মানব বেরা মাল্যদান করেন। তারপর মরদেহবাহী গাড়ি কোলাঘাট অভিমুখে রওনা হয়। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোলাঘাটে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে তাঁর মরদেহ রাখা হয়। দলের মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড করুণ ব্যানার্জী ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং প্রয়াত কমরেডের বড় ছেলে ও জামাই মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও 'আন্তর্জাতিক' গাইতে গাইতে কমরেডরা তাঁর মরদেহ নিয়ে কোলাঘাটে রূপনারায়ণের তীরে শ্মশানে যান এবং সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সুধীর পাল, বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায় ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রিয় নেতা প্রয়াত কমরেড নীহার মুখার্জীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অনুগত ছিলেন। এই প্রক্রিয়াতেই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি সরকারের কৃষিদপ্তরে চাকরি নেন। সরকারি চাকরির তৎকালীন কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও তিনি সর্বদা আশপাশের মানুষ ও পরিচিতদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও দলের আদর্শ প্রচার করতেন, দলের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করতেন।

জেলা কৃষি অফিসার হিসাবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি জলপাইগুড়িতে বদলি হয়ে যান। দলের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী জলপাইগুড়ি গেলে কমরেড সুধীর পাল তাঁকে বিভিন্ন বামপন্থী এবং মার্কসবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করাতেন, তাঁদের পার্টির পত্রপত্রিকা ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বই দিতেন। ইতিমধ্যে যে কতিপয় যুবক মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আর্দশ বুকে নিয়ে ঐ জেলায় দলের কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের পিছনে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা নিয়ে দাঁড়ান কমরেড সুধীর পাল। চাকরি থেকে উপার্জিত অধিকাংশ অর্থই তিনি দলকে দিতেন ও কর্মীদের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর এই অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৯ সালে জলপাইগুড়িতে যে সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনার ভিত্তিতেই 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' এই ঐতিহাসিক পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল, সেই সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে আড়ালে থেকে কমরেড সুধীর পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চাকরি ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শবাদী আচার-আচরণ সহকর্মীদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি নিজেকে পুরোপুরি পার্টির হাতে সঁপে দেন। পার্টি তাঁকে ঘাটশিলায় 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্র' তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেয় এবং তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই দল তাঁকে ঘাটশিলা থেকে এনে কোলাঘাটে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা সেখানকার মানুষদেরও তিনি প্রিয়জনে পরিণত হন। এই প্রবীণ কমরেডের মৃত্যুতে দল একজন যথার্থ আদর্শবাদী ও একনিষ্ঠ পার্টিসংগঠককে হারাল।

কমরেড সুধীর পাল লাল সেলাম

চটকল মালিকদের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ও বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

৬১ দিন ধর্মঘটের পর পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি চালু হতে না হতেই মালিকরা নানা অজুহাতে একের পর এক মিল বন্ধ করে দিচ্ছে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মালিকরা শত শত শ্রমিককে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই না দিয়ে কাজ করাচ্ছে। সদ্য স্বাক্ষরিত চুক্তির সুযোগ নিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের বকেয়া ডিএ দিতে অস্বীকার করছে, কুখ্যাত 'উৎপাদনভিত্তিক বেতন'-এর অজুহাতে শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং স্থায়ী কাজে স্থায়ী শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে কম বেতনে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করছে। এরই ফলে সমস্ত চটকলে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে এবং মালিকরা রিলায়েন্স, নদিয়া, জগদ্দল, ভদ্রেশ্বর, আগরপাড়া জুট মিলে লক-আউট জারি করেছে। সর্বশেষে ১৪ মার্চ ভিক্টোরিয়া জুট মিলে লকআউট জারি হয়েছে। প্রতিবাদী শ্রমিকদের পুলিশ দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই চটশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। অবিলম্বে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী এই সমস্ত কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সমস্ত মালিকদের কাছে দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি করছি, মালিকদের এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। ৯ মার্চ মহাকরণে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিংয়েও আমরা এই দাবি জানিয়েছি।

চটশিল্পের সমস্ত শ্রমিকদের কাছে আমাদের আবেদন, মিলে মিলে সংগ্রামী কমিটি গঠন করে মালিক এবং সরকারের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। একমাত্র সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে এই আক্রমণ রুখতে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সরকারি ঘোষণা

শিক্ষার আরও সর্বনাশ ডেকে আনবে

সেদিন ছিল শনিবার। বেলা দুটো। দক্ষিণবঙ্গের একটি মাধ্যমিক স্কুলে সমস্ত ক্লাশ ছুটি হয়ে গেছে, কিন্তু ক্লাস ফাইভ চলছে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। বাংলার শিক্ষক সমরেশবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়েই বললেন, 'এ বছরের ক্লাস ফাইভকে বাংলা পড়িয়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এক লাইন বাংলা ভাল করে পড়তেও পারছে না। কী বিপদ আমার ভাবুন! প্রতি শনিবার ওদের দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের থেকে বানান-উচ্চারণ অভ্যাস করাচ্ছি।' ছাত্রছাত্রীদের কেন এমন হাল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, 'সরকারি নিয়মে ক্লাস ফোর পর্যন্ত তো পাশফেল নেই। সবাই পাস। ফলে, প্রাইমারির পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে। সচেতন বাবা-মা হলে, আর না হলে প্রাইভেট টিউশন দিয়ে সামাল দেয়। কিন্তু, সেই সংখ্যাও গ্রামীণ এলাকায় খুবই কম। তাই, অঙ্ক-ইংরেজি দূরের কথা, মাতৃভাষা বাংলাও পড়তে পারছে না।'

এই পাশফেল তোলার সিদ্ধান্ত সিপিএম সরকারেরও

এসব বেশ কয়েক বছর আগের কথা। এখন সেই শিক্ষকমশাই অবসর নিয়েছেন। আজ তিনি কর্মরত থাকলে, তাঁকে আর দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না এবং প্রতি শনিবার আর ক্লাস ফাইভকে পড়ানোর জন্য অতিরিক্ত দু-ঘণ্টা ব্যয়ও করতে হত না। কারণ, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিব্বাল ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারও ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিচ্ছে। এবার সবাই পাশ। এক বছর পর ছাত্রছাত্রীরা অবধারিতভাবে পরের ক্লাসে উঠে যাবে, সে পড়াশুনো করুক আর নাই করুক।

এই সিদ্ধান্তে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই উদ্বিগ্ন। তাঁরা মনে করছেন, এর ফলে শিক্ষার মান আরও নামবে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে, অজ্ঞানতা বাড়বে, ছাত্রদের মেরুদণ্ড নুইয়ে যাবে, বেশি করে 'জো হুজুর' তৈরি হবে। জনমনে এই বিরূপতার সামাল দিতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে আগেভাগেই বলে রেখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই তাঁরা কার্যকর করছেন মাত্র, কারণ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে। যেন বিষয়টিতে তাঁদের মত নেই, কেন্দ্র বলছে বলেই তাঁদের করতে হচ্ছে। এটা নির্ভেজাল মিথ্যে ও চালাকি। পুঁজিবাদের প্রয়োজনে শিক্ষা সংকোচনের যে যে নীতি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পর থেকে অনুসরণ করে আসছে, সিপিএম পুঁজিপতিশ্রেণীকে তুষ্ট করতে সেইসব নীতি রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৮৩ সালে রাজ্যে প্রাইমারি থেকে পাশফেল তুলে দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজেই বলেছিলেন, 'নো ডিটেনশন' এ রাজ্যে আপাতত ক্লাস ফোর পর্যন্ত চালু করা হচ্ছে, পরের ধাপে এটি ক্লাস এইট পর্যন্ত করা হবে। কিন্তু, ক্লাস ফোর পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যে এমন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে যে, এতকাল সিপিএম সরকার এ বিষয়ে আর বেশিদূর এগুতে পারেনি। এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণার পর রাজ্য সরকার তাদের ১৬-১৭ বছর আগের পরিকল্পনাকেই রূপায়িত করছে।

প্রাইমারিতে পাশফেল তুলে দেওয়ার করুণ পরিণতি

সিপিএম সরকার পাশফেল তুলে দেওয়ার পদ্ধতিকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সে সময় বলেছিল, তারা ছাত্রছাত্রীদের 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' করবে এবং তাতে নাকি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানের ক্রমোন্নতি ঘটবে। বলেছিল, ছাত্রছাত্রীদের উপর থেকে পরীক্ষা-ভীতি তথা আতঙ্ক কাটিয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। তার ফলে স্কুলছুট ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমবে। কিন্তু বাস্তবে কী দাঁড়িয়েছে? স্কুলছুট ছেলেমেয়ের সংখ্যা কি কমেছে? শিক্ষার মানের কি উন্নতি ঘটেছে? ২০১০-এর ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে যে 'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশনাল রিপোর্ট (রুরাল) ২০০৯' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অধোগতির চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার নিরাশাময় চিত্রটিও। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে স্কুলছুট ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমেনি। এ রাজ্যে ক্লাস ফাইভের শতকরা প্রায় ৬৭ জন ক্লাস ওয়ানের বাংলা পাঠ্যবইও পড়তে পারে না, শতকরা ৫৪ জন ক্লাস টুয়ের বাংলা পাঠ্যবই পড়তে পারে না। শতকরা ৬৫ জন ছেলেমেয়ে সরল বিয়োগ করতেই শেখেনি, ৬৪.৫ জন সরল ভাগ করতেও পারে না। ২য় শ্রেণীর

ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জনেরও বেশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে শেখেনি।

অর্থাৎ, 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' বাস্তবে নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।পাশফেল তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্যের সিপিএম সরকার প্রকৃতপক্ষে পড়াশুনোর পাঠকেই পুরো লোপাট করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীর জীবনপ্রভাতে যে প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র জীবনের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যে ভিত্তি মজবুত না থাকলে পরবর্তী কাঠামো নড়বড়ে হয়ে থাকবে, সেই প্রাথমিক ভিত্তিকেই পুঁজিবাদের স্বার্থে তারা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে ও দিচ্ছে।

এক প্রাইমারি শিক্ষক বলছিলেন, 'আমার স্কুলে চারটে ক্লাস, দু'জন শিক্ষক। তার মধ্যে, কেমন করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হবে সে বিষয়ে একজনের প্রায় সবসময় সরকারি ট্রেনিং চলছে। স্কুলে এসে পড়ানোর সময় তাঁর সাধারণত হচ্ছে না। আর, আমার তো মাঝেমধ্যেই সরকারি দায়িত্ব এসে পড়ছে — যে সমস্ত কাজ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে করতে হচ্ছে। ফলে কখন পড়াবো, আর কীই বা পড়াবো? এস আই (সার্কেল ইন্সপেক্টর)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে উনি বললেন, 'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আপনি খাতাপত্রগুলো ঠিক রাখুন।' তার ফলে, প্রাইমারিতে মূল্যায়নের জন্য ছেলেমেয়েদের যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, শিক্ষকরাই বলছেন, তাতে 'ছেলেমেয়েরা অংকের ভাষা পড়ে বুঝতেই পারে না, অংক করবে কী!' ক্লাস থ্রি-র বহির্মূল্যায়নের নামে আলাদা স্কুলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে স্কুলে-স্কুলে, সার্কেলে-সার্কেলে শিক্ষকদের মধ্যে বোঝাপড়া করে উত্তর বলে দেওয়া হচ্ছে।

এই হচ্ছে রাজ্যের প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থায় পাশফেলহীন 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের' অনিবার্য পরিণাম। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নিয়মিত পঠনপাঠন তুলে দেওয়ার সুযোগে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল ইংরেজি মাধ্যম বহু বেসরকারি স্কুল, যার অধিকাংশেরই মালিক প্রধান শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের আপনজনেরা। খানিকটা আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন অনেকেই সন্তানদের সেই স্কুলে ভর্তি করেছেন। আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নে যাঁরা একান্তই নিরুপায়, একমাত্র তাঁরাই সন্তানদের রেখেছেন সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। সরকারি স্কুলে ছাত্র কমে গিয়েছে ব্যাপকহারে। শুধু তাই নয়, ছাত্রের অভাবে গত ২০ বছরে রাজ্যের প্রায় ৩০০০ সরকারি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। খোদ কলকাতায় এই সংখ্যা ১৫০টি। পুঁজিবাদের প্রয়োজনে এটাই চেয়েছে সিপিএম, এটাই চেয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। এটাই চেয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যতম প্রতিনিধি বিশ্বব্যাঙ্ক দেশে দেশে টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে। দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি করছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ যাতে ঘটানো যায়। উদ্দেশ্য ব্যবসা, শুধুই ব্যবসা। আর তা থেকে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা। এই উদ্দেশ্যেই ডিপিইপি-র আবির্ভাব ও সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্ম। কোটি কোটি টাকা জলের মতো খরচ করে 'সকলের জন্য শিক্ষা চাই' এই গালভরা স্লোগানের আড়ালে যে নীল-নক্সা তৈরি করা হয়েছে, তা বাস্তবে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা সহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের, সরকারি শিক্ষা কাঠামোর অবলুপ্তির নক্সা।

হাইস্কুল শিক্ষাকেও ব্যবসাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার ছক

এবার সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের অবলুপ্তিরও নীল-নক্সা রচনা করে এগুচ্ছে সরকার। ব্যয়বহুল বেসরকারি বহু মাধ্যমিক স্কুল ইতিমধ্যেই গজিয়ে উঠেছে। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের বিকল্প হিসাবে তা এবার আরও গজিয়ে উঠবে। সেই এক মন্ত্র — এডুকেশন ইজ এ ইউনিক ইনভেস্টমেন্ট (শিক্ষা একটি চমৎকার মুনাফাযোগ্য বিনিয়োগ)। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' রচিত হয়েছিল, তার ছিল এই ঘোষণা। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করেও সরকার শিক্ষার বেসরকারিকরণকেই ত্বরান্বিত করছে 'ইউনিক ইনভেস্টমেন্ট'-এর লক্ষ্যে। পরিকাঠামোহীন সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকে পাশফেলহীন গ্রেডেশন পদ্ধতি নির্ভর করে তুললে সেখানে শিক্ষার মান ক্রমাগত নামতে বাধ্য। ন্যূনতম সঙ্গতিসম্পন্ন অভিভাবকরাও তখন সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাধ্য হয়ে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করাবেন। যাঁদের আর্থিক ক্ষমতায় আদৌ কুলোবে না, শুধু সেই অভিভাবকরাই নিরুপায় হয়ে সন্তানদের সরকারি স্কুলে ফেলে রাখবেন, যেমনটি প্রাইমারি স্কুলের ক্ষেত্রে হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলের মতো ইতিমধ্যে রাজ্যে বেশ কিছু সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা যত বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকবে, তত বেশি বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বালের ঘোষণার পরপরই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জানিয়েছেন যে, পাশফেল তুলে দেওয়ার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি; সিদ্ধান্ত হবে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনার পর। এটিও চালাকির কথা। সিব্বালের ঘোষণা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অত্যন্ত পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। ৫ বছর আগে থেকে এই জিনিসটি করার উদ্যোগ চলছে। ২০০৫ সালেই এন সি ই আর টি দ্বারা গঠিত ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি এফ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ করেছিল, 'প্রাথমিক স্তরে কোনও প্রথাগত পরীক্ষা থাকবে না, কোনও গ্রেড বা নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, থাকবে না কোনও ফেল করার ব্যবস্থা...' (৩.৩.১ - দ্য কারিকুলাম অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস)। এরপর বলা হয়েছে, উচ্চপ্রাথমিক স্তরে (ক্লাস সিক্স থেকে এইট) ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা থাকবে, ফেল থাকবে না। যে ছাত্রটি আট বছর স্কুলে কাটিয়েছে, সে ক্লাস নাইনে পড়বার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে' (৩.৩১)। সিপিএম সরকার প্রাইমারিতে পাশফেল তুলে দিতে যেসব যুক্তি দেখিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারও ব্যবসায়ী স্বার্থে ঠিক সেই যুক্তিগুলি আওড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে আরও বলছে, 'পরীক্ষাপদ্ধতি ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। তবু ৫০ শতাংশেরও বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলছুট হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ন্যূনতম মানটাই গড়ে ওঠেনি'। স্কুলছুট হওয়ার কারণ যে দারিদ্র্য, সেটা সরকারই স্বীকার করেছে এবং স্কুলে ছেলেমেয়েদের ধরে রাখতে 'মিড ডে মিলের' ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হয়েছে। পড়াশুনোর মান খুব খারাপ বলে একটা অংশ স্কুল ছেড়ে দেয়। আবার, যাদের মান ভাল, তাদেরও দারিদ্রের জ্বালায় স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হয়। স্কুলে একবেলা খাওয়া জোটে, তাও রবিবার জোটে না। সকালে ও রাতের খাবার সংগ্রহ করবে কী করে? অগত্যা চায়ের দোকানে, হোটেলে-রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপ-থালা-বাসন ধুয়ে নিজের পেট চালাতে হয়। এই দারিদ্র্য দূর করার কোনও কার্যকরী উদ্যোগ সরকারের নেই। সরকারের কাজ মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো, মানুষকে ক্রমাগত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করা। নিজেদের এই অপকর্ম চাপা দিতে তারা বলছে, পাশফেল প্রথার জন্যই নাকি স্কুলছুট বাড়ছে। আর, পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলেই যে শিক্ষার মান অত্যন্ত নেমে গেছে, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। প্রচার করা হচ্ছে, 'পরীক্ষাভীতি থেকে ফেল করার কারণে দেশে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার হার প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো দেখিয়েছে, '২০০৬-০৭-এ ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যা প্রায় ৭ শতাংশ বেড়েছে। ফলে, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাশফেলের আতঙ্ক দূর করতে হবে'। সরকার যেন কত উদ্বিগ্ন! অথচ, তারাই পিটিটিআই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথে না গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩ জন ছাত্রকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে। আরও কতজনকে যে আত্মহত্যা

চারের পাতায় দেখুন

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে বিক্ষোভ

রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি মেনেই চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সর্বনাশা সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের রাজ্য কমিটির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল পর্ষদ সভাপতিকে ডেপুটেশন দেয়। বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার কালা সার্কুলারের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র। বক্তব্য রাখেন কমরেডস মলয় পাল, রাজকুমার বসাক, সরোজ মাইতি প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

সীমাহীন বঞ্চনার শিকার কলেজের পার্ট-টাইম শিক্ষকরা

সিপিএম শাসনে এ রাজ্যের পার্ট টাইম শিক্ষকরা যে বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছেন তাকে লজ্জার বললেও কম বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে চারশো' কলেজের অধিকাংশ কলেজেই পর্যাপ্ত স্থায়ী শিক্ষক নেই। কলকাতা শহরের সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ২১, আংশিক সময়ের শিক্ষক ৫৫। ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজে স্থায়ী শিক্ষক মাত্র ৭ জন, অস্থায়ী শিক্ষক ২৭ জন, স্থায়ীর প্রায় চারগুণ। জেলাগুলির অবস্থা আরও খারাপ। বিদ্যাসাগরের জেলা মেদিনীপুরের কেশপুর কলেজে স্থায়ী শিক্ষক ৩ জন, অস্থায়ী শিক্ষক ৩৫, গোয়ালতোড় কলেজে এই অনুপাত ৪ঃ৩৭। এই চিত্র কি প্রমাণ করে সরকার শিক্ষাকে সত্যিই গুরুত্ব দেয়? যদি সরকার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিত তাহলে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্ব না দিয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা কেন?

আংশিক সময়ের শিক্ষকদের বঞ্চনা বিচিত্ররকম। এঁদের নেই চাকরির স্থায়ীত্ব, নেই বাঁচার মতো সুনির্দিষ্ট বেতন, নেই শিক্ষক হিসাবে সম্মান। এঁদের রয়েছে যে কোনও সময়ে ছাঁটাইয়ের ভয়, রয়েছে যে কোনও সময়ে চুক্তি বহির্ভূত বাড়তি কাজের বোঝা চাপার আশঙ্কা। একজন আংশিক সময়ের শিক্ষকের সরকারি নির্দেশানুসারে যে পরিমাণ ক্লাস নেওয়ার কথা, বাস্তবে নিতে হয় তার বেশি। কলেজে সপ্তাহে ২/৩ দিন যাওয়ার কথা থাকলেও যেতে হয় ৫/৬ দিন, ৭/৮ টি ক্লাস নেওয়ার কথা থাকলেও নিতে হয় ১৫/২০ টি। এছাড়া ছাত্রভর্তি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা নেওয়া, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবে অন্য কলেজে যাওয়া, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষামূলক ভ্রমণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কলেজ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই করতে হয়। বাস্তবে পার্টটাইম শিক্ষকরাই কলেজীয় শিক্ষার প্রধান বাহন, স্থায়ী শিক্ষকরা সংখ্যালঘু। পরিস্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়েছে, কোনও কোনও কলেজে এক একটা ডিপার্টমেন্ট চালানোর মত কাজও এই আংশিক সময়ের শিক্ষকদের করতে হচ্ছে। যাঁরা এতবড় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সেই শিক্ষকদের বেতন কত? এঁদের মাসিক বেতন কোথাও ৫০০ টাকা, কোথাও ৮০০ টাকা, কোথাও ২০০০, কোথাও আর একটু বেশি।

এই সামান্য পরিমাণ টাকায় চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি ও টাকার মূল্যহ্রাসের এই বাজারে একটা পরিবার প্রতিপালন তো দূরের কথা, নিজের খরচ চালানোই যে সম্ভব নয় এই সামান্য কথাটা, এ দেশের শিক্ষকদের দুর্ভাগ্য, তাঁরা মিছিল মিটিং করেও বধির সরকারকে শোনাতে পারছেন না। এই শিক্ষকরা যে সমাজবদ্ধ মানুষ, তাঁদেরও যে পারিবারিক-সামাজিক সহ নানাবিধ দায়িত্ব পালনের ব্যয় বহন করতে হয়, দুর্ভাগ্য, সরকারে আসীন বিবেকহীন মন্ত্রীদের তা বোঝাতে শিক্ষার অঙ্গন ছেড়ে তাঁদের রাস্তায় নেমে চিৎকার করতে হচ্ছে।

অবস্থা কত ভয়াবহ, তা বোঝা যায় যখন ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি পার্ট টাইম টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক ইলোরা বিশ্বাস বলেন, সরকার যদি দাবি না মানে তাহলে আলু পটলের ব্যবসা করতে হবে। বাস্তবে আলুর খুচরো ব্যবসায়ী বা একজন কৃষিমজুর দৈনিক যে উপার্জন করেন বহু পার্ট টাইম শিক্ষকদের সেটুকুও বেতন দেওয়া হয় না। তীব্র বেকার সমস্যার সুযোগ নিয়ে এই সরকার পার্ট টাইম শিক্ষকদেরকে কলেজে কার্যত বেগার খাটাচ্ছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে পার্ট টাইম শিক্ষকরা আন্দোলনের জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ দেবনাথ বলেন, কলেজগুলি এখন পার্ট টাইম শিক্ষকদের উপর ভর করেই চলছে। এই শিক্ষকদের দাবি যদি সরকার গুরুত্ব সহ বিবেচনা না করে, তাহলে তাঁরাও অসহযোগিতার পথে যেতে বাধ্য হবেন। তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যেই

তিনের পাতার পর

করতে হবে, কে জানে! পরীক্ষাভীতি দূর করা, মানে কি পরীক্ষা তুলে দেওয়া? অবশ্যই তা নয়। প্রয়োজন, বোঝা মুক্ত এবং উপযুক্ত সিলেবাস, শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ, জানার আগ্রহ ও ক্রিয়াশীল জ্ঞানের পরিপূরক পঠন-পাঠনের মান, শিক্ষামনস্ক সামাজিক দায়বদ্ধ ছাত্রদরদী বিবেকবান শিক্ষক। এই বাইরে যা বলা হচ্ছে তা কুযুক্তি। মাথাব্যথা হলে মাথাটাই বাদ দিয়ে দেওয়ার যুক্তি।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের নামে
নিরবচ্ছিন্ন সর্বনাশ

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের নামে সরকার পাশফেল তুলে দিল। মাধ্যমিক স্তরের পাশফেল প্রথা ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের একটা ব্যবস্থা। ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হত। তাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের অবস্থা ধরতে পারত। তারপর বাৎসরিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোর চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হত। তাতে পাশ করতে না পারলে পরবর্তী ক্লাসে পড়ার যোগ্য বিবেচনা করা হত না। পুরনো ক্লাসেই থাকতে হত, পরের উচ্চতর ক্লাসের উপযুক্ত করে নিজেদের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বাড়িয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু, ১৯৮৩ থেকে এ রাজ্যে প্রাইমারিতে পাশফেল উঠিয়ে দেওয়ার পর থেকে ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা বাংলা সহ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষার ভিতটা এমন দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেওয়া হল যে, তারা মাধ্যমিক স্কুলে প্রবেশের পর পরীক্ষা পাশের জন্য গৃহশিক্ষক ও প্রাতিষ্ঠানিক কোচিংয়ের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হল। এখন এই পদ্ধতি ছাড়া তারা এক পাও হাঁটতে পারছে না। অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস রিপোর্টে (২০০৯) দেখা যাচ্ছে, ২০০৭-০৯-এর মধ্যে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউশন পড়া সারা দেশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে বেড়েছে এবং এই হার পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি। এই দুর্দশার জন্য সরকার ও তার নীতিই কি পুরোপুরি দায়ী নয়? অথচ, নির্লজ্জের মতো সরকারই বলছে, এই দেখো, ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট কোচিং নির্ভর হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি তথা স্বকীয়তা গড়ে উঠছে না। অতএব এই ব্যবস্থা চলবে না, 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' পদ্ধতি চালু করতে হবে। বলেই তারা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের নামে বছরে আরও কয়েকটা পরীক্ষা বাড়িয়ে দিল মাত্র।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন কোথায় সম্ভব

'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' পদ্ধতি সেখানেই ভাল, যেখানে একটি ক্লাসে বা একটি সেকশনে ছাত্রসংখ্যা ২০ থেকে ২৫ জনের মধ্যে থাকে। সেইখানে ইউনিট টেস্টগুলো করলে ছাত্রদের যেমন একটা পরীক্ষা হয়, তারা কতটা শিখল না-শিখল সেটা বোঝার জন্য, তেমন শিক্ষকেরও পরীক্ষা হয় তিনি কতটা শেখাতে পারলেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষক তাঁর পড়ানোর রীতি-প্রক্রিয়া, স্টাইল পরিবর্তন করেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তথা দেশে এটা কি সম্ভব, না কি বাস্তবসম্মত? পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের সরকার নির্ধারিত অনুপাত ১ঃ৮০। এই অবস্থায় শিক্ষকরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর প্রতি আলাদাভাবে নজর দেবেন কী করে? তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয়ে বা স্ট্রিমে আগ্রহী সে ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শুধু দেখা হয়, কোন বিষয় নিয়ে পড়লে চাকরির বাজারে ঢুকতে পারবে, কেরিয়ার গড়তে পারবে। ফলে শিক্ষায় জ্ঞানের সাধনা থাকে না। অবস্থা দাঁড়ায় তোতাপাখির মত। ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন স্বপ্নচারী হয়ে আকাশেই বিরাজ করে। মাটিতে শেকড় গাড়ে না। যে কোনও মূল্যায়নের মুখ্য বিষয় হচ্ছে, কোথায় কোন ছাত্রছাত্রীর কী ধরনের ভুলত্রুটি হচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের সযত্নে সতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু, বছরব্যাপী লাগাতার ইউনিট টেস্ট গ্রহণের প্রক্রিয়ার ফলে শিক্ষকদের উপর খাতা দেখা ও পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরির চাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সময়ের অভাবে ভুলত্রুটি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করার অবকাশই থাকে না। তাঁরা নির্ধারিত সিলেবাসটা শেষ করতেই হিমসিম খাচ্ছেন। তাহলে, এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা কোথায়!

উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সুযোগ
বন্ধ করার ষড়যন্ত্র

সর্বাগ্রে প্রতিটি ক্লাসে বা সেকশনের ছাত্রসংখ্যা ২০-২৫ জনের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করে তারপর 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' পদ্ধতি শেখানোর গুণগত মান ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি কার্যকর করা হোক। আসলে, সরকারের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পরিণাম এমনই যে, পাশফেল প্রথা থাকলে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের উপরের ক্লাসে ওঠাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তাই মুশকিল আসানের দাওয়াই — সবাই পাশ। হাইস্কুলে আসার পর বাৎসরিক পরীক্ষায় পাশ না করে উপায় নেই বলে ক্লাস ফাইভ থেকেও ছাত্রছাত্রীরা যতটুকু পড়াশুনোর চেষ্টা করত, এবার আর সেই চেষ্টাও করতে লাগবে না। না পড়লেও যদি পরবর্তী ক্লাসে ওঠা যায়, তাহলে কি পড়াশুনোর মানসিকতা থাকে? অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস রিপোর্ট (২০০৯) দেখিয়েছে, ইংরেজি ভাষা শেখার অবস্থা, অর্থাৎ ইংরেজি অক্ষর চেনা, শব্দ ও বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতার প্রশ্নে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত সারা দেশের সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের গড় অবস্থা বেশ খারাপ। এই দুরবস্থার রেখচিত্র প্রতি বছরই নিম্নগামী। এ বিষয়ে দুরবস্থার একেবারে তলার দিকে যে রাজ্যগুলি রয়েছে, তাদের অন্যতম সিপিএম সরকারের সুদীর্ঘকালের রাজত্ব এই পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু ক্লাশ ফাইভের পর ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গুরুত্ব পেত। কারণ, ক্লাস ফাইভের থেকে এতকাল পাশফেল চালু এবং মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশের তাগিদ ছিল। ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেবার ফলে নিম্নবিত্ত, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পথ রুদ্ধ হবে।

অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় ও চাকরির পরীক্ষায় যাতে এই ছেলেমেয়েরা নিশ্চিতভাবেই ফেল করে তারই আগাম ব্যবস্থা হিসাবে এই ঢালাও পাশের ঘোষণা। গরিব সাধারণ পরিবারের সন্তানদের পড়াশুনো লাটে উঠবে। যারা বেসরকারি ব্যয়বহুল স্কুলে পড়বে, তারাই একমাত্র উচ্চশিক্ষায় ও চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। এইভাবে গড়ে তোলা হবে দুই শ্রেণীর নাগরিক। এক শ্রেণী সংখ্যায় কম, কিন্তু অর্থবান, শিক্ষা ও চাকরির জগতে অগ্রসর। অপরটি সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব-নিম্নবিত্ত-সাধারণের শ্রেণী, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির জগতে যাদের প্রবেশ নিষেধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার দশম শ্রেণীর পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক করার প্রস্তাবও করে রেখেছে। ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-এর ডকুমেন্টেই বলা হয়েছে, 'দশম শ্রেণীর পরীক্ষা কেবলমাত্র তাদের জন্যই ব্যবস্থা করা হোক, যারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে, অন্যরা স্কুল থেকেই একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিতে পারবে' (৫.৩.২, চ্যাপ্টার-৫, পৃষ্ঠা-২৪)।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য শিক্ষা মানুষের চেতনার বিস্তার নয়। একদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারি মুনাফাশিকারীদের লুণ্ঠনক্ষেত্র করে তোলা এবং অন্যদিকে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের গায়ে ক্লাস এইট পাশ একটা সার্টিফিকেট লাগিয়ে দেওয়া এবং স্ট্যাটিসটিক্স দেখানো যে, দেখো, রাজ্যে তথা দেশে কত সাক্ষর! কিন্তু, সাক্ষরতা তো জ্ঞানের জন্য, শিক্ষার জন্য। সরকারি এই সাক্ষরতা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের সামনে জ্ঞানের দরজা বন্ধ করার জন্য, রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্ব জাহির করবার জন্য, অশিক্ষা ও অন্ধতার ফাঁদে গরিব নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষকে কৌশলে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য। দেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃত জ্ঞানার্জনের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকলে শাসকদের খুব সুবিধা। অশিক্ষিত-অজ্ঞ, অল্পশিক্ষিত এবং ভুল শিক্ষিত মানুষকে সহজেই বিপথে চালিত করে মতলব হাসিল করা যাবে। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ও কম্পিউটার-অটোমেশনের যুগে দেশে অল্পসংখ্যক দক্ষ শ্রমিক হলেই শাসক ও মালিকশ্রেণীর কাজ চলে যাবে। আপামর যুবক-যুবতী শিক্ষিত হয়ে চাকরি চাইলে বিপদ। শাসকদের কাছে শিক্ষিত বেকারবাহিনী অত্যন্ত বিপজ্জনক। সরকার পরিকল্পনা করেই ছেলেমেয়েদের অজ্ঞ এবং ভ্রান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাখবে। আবার, চাকরি চাইলে সরকারই বলবে, 'তোমরা তো কিছুই শেখোনি, চাকরি করবে কী করে! তোমরা অপদার্থ! তোমাদের এই অজ্ঞতা-অশিক্ষার জন্য তোমরাই দায়ী।' কী চূড়ান্ত কপটতা ও প্রতারণা!

আমরা রাজ্যবাসী তথা দেশবাসী সাধারণ মানুষকে প্রতারণার এমন ছক বুঝতে পেরেও কি ঘরে বসে হা-হুতাশ করব যে, 'হায়! কী সর্বনাশ হচ্ছে!' তাহলে সর্বনাশ আরও লাগামছাড়া হবে। আসুন, যে লাগাতার আন্দোলন এ রাজ্যের উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী সরকারের মাথা নুইয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য প্রাইমারিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে এনেছিল, সেই পথ অনুসরণ করি, একমাত্র তাহলেই আমাদের সন্তানদের সর্বনাশকে রুখে দিতে পারি।

নিউক্লিয়ার ড্যামেজ বিল

একের পাতার পর

আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে পারবে, কিন্তু ওই সরবরাহকারীদের দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। ৫০০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতির ক্ষেত্রে ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে, যদিও সেই দায়ও সর্বাধিক মাত্র ২ হাজার ৮৭ কোটি টাকার (৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার) মধ্যেই সীমিত থাকবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই অর্থ জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশগুলি কর্তৃক তাদের দেশে দেয় শত শত কোটি ডলার এবং জার্মানি কর্তৃক তাদের দেশে দেয় সীমাহীন ক্ষতিপূরণের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তেজস্ক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের লক্ষণ আক্রান্তের দেহে ফুটে উঠতে অনেক ক্ষেত্রে বহু বছর সময় লাগে এবং তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়, এ কথা জানা সত্ত্বেও এই বিলে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনের মেয়াদ মাত্র ১০ বছরে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন অপরাধী বিদেশি সরবরাহকারীরা আইনি সুরক্ষার আড়ালে সুরক্ষিত থাকবে, অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্য শুধু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তাই নয়, আর্থিক বোঝাও তাদেরই বহন করতে হবে।

কমরেড ঘোষ বলেন, আমরা প্রস্তাবিত এই বিলটি সম্পূর্ণরূপে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং এই কালা বিলটির আইনে রূপান্তরিত হওয়া রুখতে ভারতের জনগণের কাছে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

এই অন্ধকার ঢাকবে কী দিয়ে

পদপিষ্ট হয়ে আবারও মর্মান্তিক মৃত্যু হল শিশু-নারী সহ ৬৫ জন নিরীহ মানুষের। এক থালা খাবার আর দশটা টাকার আশায় দারিদ্রসীমার নিচে বাস করা প্রায় পনেরো হাজার মানুষ ছুটে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের এক আশ্রমে। কে কাকে পিছনে ফেলে আগে পৌঁছবে তারই হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন তাঁরা। আহতও হন কয়েক শত। ক্ষুধাতুর মানুষের এমন অপঘাত মৃত্যুর কথা যাঁরাই জেনেছেন, তাঁরা ব্যথিত হয়েছেন আর ভেবেছেন, কেন এমন হয়? কেন শুধু দু'মুঠো খাবারের জন্য স্বাধীন দেশের মানুষকে আজও এমন করে প্রাণ দিতে হয়?

এমন ঘটনা এই প্রথম নয়, আগেও ঘটেছে বারবার। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতা লালজি ট্যান্ডনের জন্মদিন উপলক্ষে শাড়ি বিতরণের জন্য আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ্ণৌয়ের চন্দ্রশেখর আজাদ পার্কে জড়ো করা হয়েছিল কয়েক হাজার দরিদ্র মহিলাকে। সেখানেও একইভাবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল একুশ জনের। দু'মুঠো খাবার বা একটা কাপড় জোটাতে গিয়ে অসহায় মানুষের এই মৃত্যু-মিছিল এভাবে আর কতদিন চলবে? সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতায়, তাঁদের অনুগ্রহভাজন অর্থনীতিবিদদের দেওয়া পরিসংখ্যানে, বিকাশের হারবৃদ্ধির ফিরিস্তিতে উন্নয়নের যে চেহারা দেশের মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরা হয়, তা যে কতবড় ধাপ্পা, প্রতাপগড়ের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে তা আরও একবার দেখিয়ে দিল। স্বাধীনতার ছ'দশকেও এই মানুষগুলির জীবনে উন্নয়নের কোনও ছোঁয়াই যে লাগেনি, দু'মুঠো খাবারের জন্য জীবন বাজি রাখার এই ঘটনাতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বোঝা যায়, বহুল প্রচারিত এই 'উন্নয়নের' সাথে আর যারই সম্পর্ক থাকুক, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে কি দেশে কোথাও কারও কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না? এই অভুক্ত, অর্ধভুক্ত দরিদ্র মানুষের দল, তথা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, মাঠে-ঘাটে-বন্দরে-কলে-কারখানায় তারা যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে, তার ফসল তা হলে যাচ্ছে কোথায়? যে চাষি গোটা পরিবার নিয়ে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দিবারাত্র পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, গোটা জাতির অন্ন জোগায়, কেন তার মুখে দু'বেলা অন্ন জোটে না? যে শ্রমিক অমানুষিক পরিশ্রম করে খনির গভীরে গিয়ে কয়লা কাটছে, তার উনুনে কেন কয়লা জোটে না? যে কর্মী সারা জীবন ধরে শুধু প্রাসাদ বানায়, তার কেন ঘর জোটে না, ঠাঁই হয় ঝুপড়িতে আর শহরের ফুটপাথে?

আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে তাদের পরিশ্রমের সমস্ত ফসলই গিয়ে জমা হয় ধনীর ভাণ্ডারে। পুঁজিপতি, জোতদার, বৃহৎ ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক, আমলা, কন্ট্রাকটর, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীরাই ভোগ করে তার সমস্ত সুফল। আর ক্রমাগত অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বীভৎস ভাবে প্রকট এই পার্থক্যটাকে চাপা দিতেই উন্নয়নের রঙিন ফানুষ ওড়ায় কেন্দ্রে-রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা ডান-বাম নির্বিশেষে সরকারি দলগুলি, তাদের নেতা-মন্ত্রীরা আর এই সুবিধেভোগীদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি। কিন্তু অর্থনীতির কোনও তত্ত্ব, কোনও পরিসংখ্যান, উন্নয়নের কোনও সাজানো তথ্য দিয়েই নিষ্ঠুর এই বাস্তবকে আড়াল করা যাচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎই কোনও না কোনও দুর্ঘটনায় তা আচমকা বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। আর তখনই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, চিন্তাশীল মানুষের হৃদয়ে প্রশ্ন উঠছে — কেন আজও মানুষের এমন দুরবস্থা? কে এর জন্য দায়ী? আর এর প্রতিকারের উপায়ই বা কী? কিন্তু এই হৃদয়াবেগ তখনই মূল্যবান যখন তা শুধু মুহূর্তের জন্যই হৃদয়কে আলোড়িত করে থেমে যায় না, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে তাঁকে ব্যাপৃত করে এবং সেইমতো মানুষকে, সমাজকে এই স্থায়ী দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে কোনও না কোনও কাজে প্রবৃত্ত করে। না হলে, এর কী মূল্য আছে?

স্বাধীনতার ছ'দশকে দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের মতো ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি আজও সরকার মেটাতে পারেনি। এমনকী এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বও দেয়নি। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজারে হাজারে মানুষ প্রাণ দিয়েছিল, লাখে লাখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে তো এই আকাঙ্খা থেকেই যে, স্বাধীন দেশে শোষণ থাকবে না, অত্যাচার থাকবে না, অশিক্ষা থাকবে না, বেকারি থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে কাউকে মরতে হবে না, মাথা উঁচু করে সকলে মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু জনতার আশা পূরণ হল না। কেন হল না? কারণ স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে আপসে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে। ফলে, দেশের বুকে আরও পোক্ত হয়েছিল শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই পরিণাম যে এই মৃত্যু, এ কথা অস্বীকার করার কি কোনও উপায় আছে?

অসংখ্য মানুষের এই অপমৃত্যু যাঁদের সামান্য হলেও ব্যথিত করবে, তাঁদের বুঝতে হবে, কৃষি, শিল্প সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়গুলি সামাজিক মালিকানাধীন নয়, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তাই পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে দেশের কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে নিঃশেষে শোষণ করে এমন হতদরিদ্র অবস্থায় ফেলে রাখা সম্ভব হচ্ছে। যতদিন এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা বজায় থাকবে, ততদিনই চলতে থাকবে এই মৃত্যু-মিছিল। এই সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে যে সমস্ত দল বা ব্যক্তি কাজ করবে, সওয়াল করবে, তাদেরই মানুষের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। সত্যিই দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতদরিদ্র মানুষগুলি সম্পর্কে এতটুকু ভাবিত হলে, এই সমাজ ব্যবস্থাই যে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের যথার্থ উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা, তা মানুষকে ধরিয়ে দিতে হবে। শিল্পে, সাহিত্যে, প্রচারে এই ব্যবস্থার শোষণমূলক, বৈষম্যমূলক চরিত্রকে উদঘাটিত করতে হবে। তবেই মানুষের জীবনের অন্ধকার ঘুচে আলো ফুটবে।

বীরভূম জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

অ্যাবেকার আহ্বানে ১৪ ফেব্রুয়ারি সাঁইথিয়া বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথি কলেজে সম্পন্ন হল ৩য় বীরভূম জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন। সম্মেলনে জেলার ১১টি গ্রুপ সাপ্লাই থেকে ৩৫০-র বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রাক্তন অধ্যাপক আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। মদন ঘটককে সভাপতি, অসিত মজুমদারকে কার্যকরী সভাপতি ও আবুল কালামকে সম্পাদক করে বিদ্যুৎ আইনের গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি তুলে ধরে রাজ্য নেতা কুণাল বিশ্বাস গ্রাহকদের দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অ্যাবেকার নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। রাজ্য সম্পাদক অনুকুল ভদ্র বলেন, একই বছরে দু'বার মাশুল বাড়ানোর প্রতিবাদে এবং ক্ষুদ্র গ্রাহকদের জন্য ভর্তুকির দাবিতে এখনই তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিশ্বায়নের নীতি মেনেই দেশি-বিদেশি একচেটিয়া মালিকের স্বার্থে পরিষেবার বদলে বিদ্যুৎকে বাজারি পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। তাই ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ভর্তুকি তুলে বৃহৎ শিল্পপতিদের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এই নীতিকে রুখে দিতে তৃণমূল স্তর থেকে কমিটি গড়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি সমস্ত প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানান। ২৬ জনের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়।

ত্রিপুরায় শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি

শহিদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ত্রিপুরা বিধানসভা (রাজবাড়ী) গেটের পশ্চিম প্রান্তে প্রখ্যাত ভাস্কর তাপস দত্তের সৃষ্টি ক্ষুদিরামের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির সহ সভাপতি অরুণ ভৌমিক। রাজ্যের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক জীতেন পাল অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে না পারায় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কমিটির সভাপতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, সুলেখক ডঃ শিশির কুমার সিংহ। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সুবোধ দাস। ভলান্টিয়ার বাহিনী কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদর্শনের পর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ক্ষুদিরাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছিল গরিব সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির জন্য। তাদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা ক্ষুদিরামরা চায়নি। আজ শোষণমুক্তির জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সে জন্য দরকার ক্ষুদিরামের মতো তেজোদীপ্ত চরিত্র। সেই চরিত্র যাতে সৃষ্টি না হয় সে জন্য শাসকরা ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং সহ বিপ্লবীদের যুবসমাজ থেকে আড়াল করে রাখছে। তাই ক্ষুদিরামকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক সার্থক প্রয়াস। তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করেন প্রখ্যাত নাট্যকার কমল রায় চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন ইউ পি এস সি-র প্রাক্তন সদস্য মানস দেববর্মা। তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং প্রস্তাব রাখেন ক্ষুদিরামের মূর্তির বিপরীত দিকের খালি জায়গায় বিপ্লবী সূর্য সেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। স্মৃতিরক্ষা কমিটি আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সাহিত্যিক নিধুভূষণ হাজরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিটির সম্পাদক হারাধন নস্কর। অনুষ্ঠানে শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন হরকিশোর ভৌমিক। তাছাড়া ক্ষুদিরামের জীবনের ৪০টি ছবির প্রদর্শনী করা হয়। অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক সহ বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি জনমানসে বিশেষ সাড়া জাগায়।

সরকারি নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আলুচাষিদের বাঁচতে হবে

একদিকে সরকারের কৃষক বিরোধী সার-বীজ-সেচ নীতি, অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং ও মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী চক্রের জালে পড়ে আলুচাষিদের জীবন আজ বিপর্যস্ত। আলু বিক্রি হচ্ছে জলের দামে। চাষের খরচটুকুও উঠছে না। এই অবস্থায় চাষিদের হয় আত্মহত্যা অথবা লড়াই—যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে। চাষিরা যে দ্বিতীয় রাস্তাটিই বেছে নিচ্ছেন, এলাকায় এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন এবং কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চাষিদের আলু এখন বিক্রি হচ্ছে কুইন্টাল পিছু ১২০ টাকা থেকে ১৪০ টাকায়। অথচ বীজ, সার, জল, কীটনাশক, মজুরি প্রভৃতি মিলিয়ে খরচ পড়েছে কমপক্ষে ৪০০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষ করে চাষিরা চরম সর্বনাশের সম্মুখীন। ৫০ কেজির এক বস্তা বীজ কিনতে হয়েছে দু'হাজার টাকা দামে। সার কিনতে হয়েছে কালোবাজারে। বর্তমান দামে এক বস্তা বীজের দাম শোধ করতেই চাষিকে দিতে হচ্ছে কমপক্ষে ৩০ বস্তা আলু। চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও জলের দামে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। অথচ কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারেরই কোনও হেলদোল নেই। রাজ্যে যেখানে প্রায় ৯৫ লক্ষ টন আলু উৎপন্ন হয়েছে, সেখানে মাত্র ৫ লক্ষ টন আলু কুইন্টাল প্রতি মাত্র ৩৫০ টাকা দামে কেনার ঘোষণা করেই রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব শেষ করেছে। উপরন্তু হিমঘর মালিকদের লাভের অঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিতে তাদের সাথে যোগসাজশে সরকার এ বছরই কুইন্টাল প্রতি আরও ১৪ টাকা হিসাবে হিমঘর ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষিদের এই দুরবস্থার জন্য আলুর অতিরিক্ত ফলনকেই দায়ী করা হচ্ছে। যেমন গত বছর আলুর দুর্মূল্যের জন্য আলুর কম ফলনকেই দায়ী করা হয়েছিল। প্রকৃত সত্য হল, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতেই রাখা হয়েছে কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। রাজ্য জুড়ে আলুচাষিরা দাবি করছেন, অবিলম্বে সরকারকে অন্তত ৩০ লক্ষ টন আলু ৬ টাকা কেজি দামে কিনতে হবে। অন্য রাজ্যে এবং প্রতিবেশি দেশগুলিতে আলু রপ্তানি ও বিপণনের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, যে সরকার টাটা সহ পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ভরতুকি, করছাড় দিতে পারে, তারা লক্ষ লক্ষ গরিব, নিম্ন ও সাধারণ মধ্য চাষিদের বাঁচাতে ন্যায্য দামে আলু কিনবে না কেন? চাষিরা তো কোনও ভিক্ষা চাইছেন না, ন্যায্য দাম চাইছেন মাত্র। চাষের খরচ ও চাষি পরিবারের সংসার নির্বাহের প্রয়োজন মাথায় রেখে আলুর দাম নির্ধারণের দায়িত্বটুকুও যদি সরকার পালন করতে না পারে, তবে সরকার জনসাধারণের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করছে? স্বাভাবিকভাবেই চাষিরা বুঝেছেন, লড়াই না করলে এই সরকারের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। তাই লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটি'। কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে চলছে বিডিও, ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, অবস্থান, পথঅবরোধ। চাষিদের আন্দোলনের চাপেই সরকার ৫ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টন আলু কেনার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির ডাকে মহাকরণ অভিযানে সহস্রাধিক আলুচাষি সামিল হয়েছিলেন। তাঁরা মহাকরণের উদ্দেশে মিছিল করেন। পথে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে অবরুদ্ধ কৃষকেরা সভা শুরু করেন এবং বিক্ষোভ দেখান। বক্তব্য রাখেন কমিটির সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ও অন্যান্য কৃষক নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, কোনও মন্ত্রী দেখা করে স্মারকলিপি না নিলে চাষিরা রাস্তায় বসে থাকবেন, সেখান থেকে নড়বেন না— চাষিদের এই মারমুখী মেজাজে পুলিশ কর্তারা মন্ত্রীদের খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অবশেষে সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর নিকট প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি দেন। সমবেত কৃষকদের নিকট বক্তব্য রাখেন কৃষক প্রতিনিধিরা। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় প্রধান সড়কগুলিতে চাষিরা আলু ফেলে অবরোধ করেন। কমিটির সভাপতি শঙ্কর ঘোষ আলু চাষিদের উদ্দেশে বলেন, আত্মহত্যা নয়, যদি মরতে হয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণই সত্যিকারের বাঁচার রাস্তা।

পরিবহণমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বাজেটে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে পরিবহণ মালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন। অদ্ভুতভাবে লক্ষ করা গেছে যাত্রীদের কোনও মতামত না নিয়ে, তাদের সুবিধা-অসুবিধাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে রাজ্যের সরকার মালিকপক্ষকে ভাড়া বাড়াবার বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১১ মার্চ পরিবহণ যাত্রী কমিটি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেয়। দাবি জানায়, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা যখন মানুষের উপর চূড়ান্ত ভাবে নেমে এসেছে সে সময় কেন্দ্রীয় বাজেটে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা চরম আঘাত স্বরূপ। এমতাবস্থায় পরিবহণে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। যাত্রী কমিটি মন্ত্রীকে আরও অবগত করে যে, ১৯৮৫ সালের ৯ এপ্রিল 'কনজিউমার প্রোটেকশান অ্যাক্ট' সংক্রান্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির পূর্বে যাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অথচ রাজ্যে ভাড়া বৃদ্ধির সময় যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলাও হয় না, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিও দেখা হয় না।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদানন্দ বাগল, কার্তিক সাহা, বিমল জানা ও দ্বিজদাস চ্যাটার্জী ডেপুটেশন দেন। পরিবহণমন্ত্রী আপাতত ভাড়া বাড়ানো যাবে না, প্রয়োজনে মালিক ও যাত্রী পরিবহণ কমিটির উভয়ের সাথেই কথা বলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া কমিটির অন্যান্য দাবি অনুযায়ী কমিশন প্রথা তুলে দেবার জন্য অমিতকিরণ দেবকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন, কেষ্টপুর মোড়ে সেতু নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা অনুমোদন, জয়নগর-ধর্মতলা সরকারি বাস চালাবার চেষ্টা, বারাকপুর-কাঁচড়াপাড়া বাসরুটের উন্নতি সাধন, নামখানা-বকখালি বাসরুটের ভাড়া সমস্যা নিরসন, ২নং এবং ৩৩ নং বাস ভায়া বেলগাছিয়া মেট্রো দত্তবাগান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নকল পরিচয়পত্র ঃ বীরভূমে শ্রমিক বিক্ষোভ

রামপুরহাট মহকুমা এলাকার হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিকের বেশিরভাগেরই পরিচয়পত্র নেই। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে একটি অসরকারি সংস্থা ২৫০ থেকে ৯০০ টাকার বিনিময়ে নকল পরিচয়পত্র দিয়ে কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিককে প্রতারিত করেছে। এর জন্য তারা মহকুমা শ্রম কমিশনারের সিল জাল করেছে এবং এসবই ঘটছে প্রশাসনের নাকের ডগায়, বলা ভাল প্রশ্রয়ে।

বিড়ি শ্রমিকদের প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন ১০ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মহকুমা শাসক প্রতারিত বিড়ি শ্রমিকদের আলাদা আলাদাভাবে অভিযোগ দায়ের করতে বলেন এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিক্ষোভকারীদের জানান। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড আয়েশা খাতুন।

পার্টটাইম সুইপারদের কোচবিহার জেলা সম্মেলন

২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পার্টটাইম সুইপারস ইউনিয়নের তৃতীয় কোচবিহার জেলা সম্মেলন শহরের হিন্দি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি জেলা কমিটির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড লক্ষ্মী চক্রবর্তী। রাজ্য সহসভাপতি ক্ষিতীশ রায় শ্রমিকদের বঞ্চনা এবং অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ মণ্ডল। তিনি পার্ট টাইম সুইপারদের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। লক্ষ্মী চক্রবর্তীকে সভাপতি করে ৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

রেল বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি

২৪ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় পেশ করা ২০১০-'১১ সালের রেল বাজেট সম্পর্কে ২৫ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়,

জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা দিতেই রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের রেল বাজেটে আরও বেশি সংখ্যায় ট্রেন চালু করার, রেলওয়ে ট্র্যাকের আরও প্রসার ঘটাবার, ক্যান্সার রোগীদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়ার, খাদ্যশস্য ও কেরোসিনের পরিবহণ ভাড়া হ্রাস করার প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু কিছু মূল সমস্যা যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগ ঘটাচ্ছে, সেগুলির প্রতি এবারের বাজেটেও ভাল করে নজর দেওয়া হয়নি। ইদানীং ট্রেন দুর্ঘটনা খুব বেড়েছে, যেজন্য অতি দ্রুত নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা বসানোর দরকার ছিল, যাত্রীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু বাজেটে এগুলি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

পূর্বতন ইউ পি এ সরকার যাত্রীভাড়া না বাড়ানোর ছদ্ম স্লোগানের আড়ালে উত্তরোত্তর সংখ্যায় 'এক্সপ্রেস' ট্রেনকেই 'সুপারফাস্ট' নাম দিয়ে অতিরিক্ত সারচার্জ আদায় করছে, রিটার্ন জার্নির বুকিং ভাড়া বৃদ্ধি করেছে, কম ভাড়ার সাধারণ স্লিপার ক্লাসের সিটগুলিকে উত্তরোত্তর সংখ্যায় বেশি ভাড়ার 'তৎকাল' কোটার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এইসব পদক্ষেপ বর্তমান রেল বাজেটেও বাতিল করা হয়নি। রেলের কামরাগুলির জীর্ণ অবস্থা, অসংরক্ষিত সাধারণ কামরার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া, প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বিশেষত ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি তুলে নেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার কার্যত অনুপস্থিতি ও সর্বোপরি জনগণের অর্থ লুণ্ঠনকারী অবাধ দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলিও বাজেটে স্থান পায়নি।

অন্যদিকে, সিপিআই(এম) সমর্থিত পূর্বতন ইউ পি এ সরকার রেলে বেসরকারিকরণের যে নীতি চালু করেছিল, শ্রীমতী ব্যানার্জী সেই বেসরকারিকরণ নীতির বিরোধী হলেও, এখন দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সাথে জোট বজায় রাখার স্বার্থে তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তিনি পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসছেন এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতি গ্রহণ করে রেলের জমি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে হাসপাতাল ও স্কুল তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করছেন, যা কার্যত পরোক্ষভাবে বেসরকারিকরণেরই নামান্তর।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, স্বাধীনতার পর থেকেই জনগণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হল, বাজেটে যেসব জনমুখী প্রস্তাব পেশ করা হয়, সেগুলির বেশিভাগই আলোর মুখ দেখতে পায় না এবং শেষপর্যন্ত তাদের স্থান হয় হিমঘরে। সেজন্যই রেলমন্ত্রীর প্রতি এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন যে, তিনি যেন বাজেটের ভাল প্রস্তাবগুলি দ্রুত কার্যকর করেন এবং সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে পীড়াদায়ক মূল সমস্যাগুলি দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেন।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কলকাতা জেলার পার্কসার্কাস ইউনিটের আবেদনকারী সদস্য কমরেড রাম অভিলাষ মুড়াই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ জানুয়ারি সকাল ৬টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ১৯৮৬ সালে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সাইনোকেস ল্যাব শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে পার্টির সাথে যুক্ত হন। বন্ধ কারখানার শ্রমিক হিসাবে তাঁর নিরলস সংগ্রামের দ্বারা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে তিনি সকলকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর পক্ষে কমরেড আয়সানুল হক এবং ইউনিট ইনচার্জ কমরেড দুলাল দাস।

৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত কমরেডের স্মরণে পার্কসার্কাস শরৎ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড রাম অভিলাষ মুড়াই লাল সেলাম।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

গ্রামের মানুষের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসক তৈরির ব্লু প্রিন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল হেলথ্ রেগুলেটরি অথরিটি বিলের প্রতিবাদে বাঁকুড়া শহরের ডি ও পি হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তা ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি. পি. চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের খাতড়া মহকুমা শাখার সভাপতি ডাঃ মহাদেব বরাট, অল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের বাঁকুড়া লোকাল কমিটির সদস্য সাধন রায়, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের বাঁকুড়া জেলার সহ সম্পাদক নদিয়া ইন্দু বিশ্বাস প্রমুখ। প্রধান বক্তা, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে বাস্তবে অর্ধশিক্ষিত চিকিৎসকদের হাতে দেশের অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। পাশাপাশি 'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' এবং 'জাতীয় স্বাস্থ্য বিল ২০০৯'-এর দ্বারা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিশ্চিহ্ন করে এই পরিষেবাকে পুরোপুরি দেশি-বিদেশি স্বাস্থ্য ও বীমা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে।

মৌলানা আজাদ কলেজে স্টুডেন্টস ফোরাম জয়ী

দীর্ঘ ৩২ বছর পর মধ্য কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস এফ আই-কে পরাস্ত করে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও সমর্থিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস্ ফোরাম ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে।

এই কলেজে ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ ৩২ বছর এস এফ আইয়ের সন্ত্রাসের জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছিল না। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র সমর্থনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস্ ফোরামের নেতৃত্বে কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে এবং লিংডো কমিশনের সুপারিশ ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে গত বছর থেকেই ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের পথ বেয়েই কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দুটি সংগঠন ঐক্যের পথে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের দু'টি সংগঠন, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নবপর্যায়'৯১ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ স্টাফলিং এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠনে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ৭ মার্চ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে রাধাকৃষ্ণন ভবনে এক সভায় কমরেড জয়দেব কর্মকার ও কমরেড দেবাশীষ ব্যানার্জীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৭ জনের নদিয়া জেলা ঐক্য প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে।

ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জয়

বালি গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুলে সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি ৬৩ টাকার পরিবর্তে ১২০ টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও আন্দোলনে নামে। এলাকার ছাত্র-অভিভাবকরাও এই আন্দোলনে সামিল হন। আন্দোলনের চাপে বর্ধিত ফি প্রত্যাহৃত হয়।

বঞ্চনার শিকার কলেজের পার্ট-টাইম শিক্ষকরা

চারের পাতার পর

বলেন, আমাদের দাবি (১) পার্ট টাইম শিক্ষকদের স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পত্র দিতে হবে, (২) যতদিন না স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে, ততদিন স্থায়ী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন, সমকাজে সমবেতন দিতে হবে, (৩) ২৭.০২.'০৯ তারিখের সরকারি আদেশনামা কার্যকর করতে হবে, ৪) ক্যাজুয়াল লিভ, মেডিকেল লিভসহ মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে, (৫) কলেজের গভর্নিং বডিতে ও টিচার্স কাউন্সিলে পার্ট টাইম শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

পার্টটাইম শিক্ষকদের প্রতি বঞ্চনার এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৩ সালের শিক্ষক ধর্মঘটের বিষয়টি অবতারণা প্রাসঙ্গিক। শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বাত্মক শিক্ষক ধর্মঘট হয়েছিল, সেই সময় যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

"যাঁহাদের কাছে শিক্ষা পাইয়া, যাঁহাদের হাতে মানুষ হইয়া, ডাক্তার, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীরা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, নিজেরা যশস্বী ও ধনবান হইয়াছেন সেই শিক্ষক সমাজ কোনও দিনই মোটা ভাত-কাপড়ের বেশি কিছু পান নাই। কিন্তু বিদ্বান, চরিত্রবান ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এই দরিদ্র সমাজ কোনও দিনই তাঁহাদের অভাবের বার্তা কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। খালিপেট ও আধপেটে থাকিয়াই তাঁহারা দিনের পর দিন দেশের ভরসাস্থল তরুণদের মানুষ করিয়া গিয়াছেন। সেই মৌন-মূক, শান্ত ও শান্তিপ্রিয় শিক্ষক সমাজকেও পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসন অবশেষে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।"

প্রতিবাদের এই পথে রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের অবসান হয়েছে। সি পি এমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিন দশকেরও বেশি কালসীমা পেরিয়ে আজ পতনোন্মুখ। শিক্ষকদের প্রতি তাদের অবদান হল, শিক্ষকদের তারা আর পূর্ণ শিক্ষক রাখেনি, অর্ধেক করে দিয়েছে। কলেজে কলেজে তাই স্থায়ী শিক্ষক বিরল হয়ে যাচ্ছেন; শোষণের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করছেন এই আংশিক সময়ের শিক্ষকরা।

কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি)

২৭ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ২০১০-'১১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে, এই বাজেট প্রকটভাবেই মুদ্রাস্ফীতিবৃদ্ধিকারী এবং অগণিত মেহনতি মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দাক্ষিণ্য বিতরণে চূড়ান্ত উদার। অকল্পনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার সাধারণ মানুষ যখন সরকারের কাছ থেকে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ আশা করেছিল, তখন এই বাজেটে এমন সব পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে, যা মূল্যবৃদ্ধির বোঝা লাঘব করার বদলে সাধারণ মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে আরও নির্মমভাবে পিষ্ট করবে। প্রত্যক্ষ কর কমানোর বাঁধা বুলি আউড়ে অর্থমন্ত্রী যা করেছেন, তা প্রধানত সমাজের ধনী ও সচ্ছল সম্প্রদায়কে এবং বৃহৎ কর্পোরেট ও পুঁজিপতিদেরই সুবিধা দেবে। অন্যদিকে তিনি অবাধে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করেছেন, যার বোঝা সাধারণ মানুষের উপরেই চালান করে দেওয়া হবে। করের হার সামান্য কমিয়ে দেওয়ার যেটুকু সুফল নিম্ন ও মধ্য আয়ের করদাতাদের উপর বর্তাবে বলে মনে করা হচ্ছে, বাজেটের অন্যান্য পদক্ষেপের ফলস্বরূপ মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বযাত্রায় অচিরেই তা অদৃশ্য হবে।

বাজেটে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সমাজকল্যাণমূলক খাতে যেখানে সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে চূড়ান্ত অনুৎপাদনশীল মিলিটারি বাজেটে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসাবে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ১১৮ কোটি টাকা আদায়ের যে অনুমিত হিসাব দেওয়া হয়েছে, সামরিক বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় তার সমান। ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকার প্রস্তাবিত মোট বাজেট ব্যয়ের প্রায় ১৩ শতাংশ হচ্ছে এই সামরিক বাজেট।

এই বাজেটের সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হল, কাস্টমস ও এক্সাইজ ডিউটি এবং পেট্রল-ডিজেলের উপর কর বৃদ্ধি করা সহ পারিখ কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পেট্রল-ডিজেলের দামের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ইঙ্গিত, যা খাদ্যশস্য সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি আরও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। একইভাবে, পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করে, পরিষেবা ক্ষেত্রের আরও বেশি অংশকে করের আওতায় এনে, সারের উপর ভর্তুকি কমিয়ে, বিলগ্নিকরণের পথে সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে, এস ই জেড-এর বৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণের কাজে বেসরকারি মালিকানাকে অংশ নিতে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিয়ে বাজেটে নির্লজ্জভাবে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। এই সব পদক্ষেপের সবক'টিই মূল্যবৃদ্ধিতে আরও সহায়তা করবে এবং জনসাধারণকে নিংড়ে নিয়ে আরও দ্রুতগতিতে তাদের উপার্জন তলানিতে নামিয়ে আনবে।

এই বাজেটে যেমন ভূমিহীনতা, কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া এবং দরিদ্র কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা বেড়ে চলার মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, তেমনই ব্যাপক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস ও আকাশছোঁয়া কর্মহীনতার সমস্যা, যা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফল হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, তা নিয়েও কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করা এখন অসরকারি সংস্থা (এন জি ও)-র হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে সরকারের ভূমিকা হবে শুধু ঐ সংস্থাগুলিকে এ কাজের জন্য সক্ষম করে দেওয়া। সরকারের মতে এ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করলেই নাকি ব্যক্তি মালিকানা-ভিত্তিক সংস্থাগুলির সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটবে।

এ থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর ঘৃণ্য শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার বাধ্য সেবক হিসাবেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার কাজ করছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের ক্রমাগত বেড়ে চলা সংকট, দারিদ্র ও দুর্দশার প্রতি তার সামান্যতম ভ্রূক্ষেপও নেই। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি এই অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রকম পেট্রোপণ্যের উপর থেকে প্রস্তাবিত বিপুল শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করার দাবিতে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

পুড়ছে জনস্বার্থবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি। ২৭ ফেব্রুয়ারি, এসপ্ল্যানেড।

মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও লালমোহন টুডু হত্যার তদন্ত সহ ১০ দফা দাবিতে ১৫ মার্চ রাজ্যের জেলায় জেলায় ২৭৩টি স্থানে পথ অবরোধ

কলেজ স্ট্রিট (উপরে বাঁ দিকে), পুরুলিয়া কাছারি মোড় (উপরে ডান দিকে) ও হাজরা মোড়

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া, ন্যাশনাল নলেজ কমিশন ও যশপাল কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ, ফি-বৃদ্ধি, লিংডো কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে ছাত্র আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে

এ আই ডি এস ও-র ডাকে

সারা বাংলা শিক্ষা কনভেনশন

২৯ মার্চ, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, সকাল ১০টা

বক্তা ঃ অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, ডাঃ অসীম রায়চৌধুরী, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত রায়, অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, এম এন শ্রীরাম, সৌরভ মুখার্জী প্রমুখ

সভাপতি ঃ অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় কমরেড নীহার মুখার্জীর স্মরণ সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণে উল্লিখিত নীহাররঞ্জন মজুমদারের জায়গায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার হবে। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সঃ গঃ

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১১ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ ১০ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯ হাজার ৫৩৭ জন মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ৫ ফেব্রুয়ারি দলের নেতৃত্বে লক্ষাধিক মানুষ মহামিছিল করে রাজ্যপালের কাছে জমা দেন। ঐ দিন দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৫ দিনের মধ্যে সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই জনগণের দাবি পূরণে কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। উল্টে, কেন্দ্রীয় বাজেটে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে, জনগণের উপর কর ও মূল্যবৃদ্ধির আরও বোঝা চাপানো হয়েছে। অথচ ধনকুবেরদের করছাড় ও ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারও পিছিয়ে নেই। বিপুল হারে বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়েছে, অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৩ বছরের ডাক্তারি কোর্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসক তৈরি করে হাসপাতালে চিকিৎসার সামান্য সুযোগও গরিব মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চলেছে।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, লালগড় সহ জঙ্গলমহলে সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী যৌথ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে মিশে বেপরোয়া খুন ও গ্রেপ্তার করছে, নারীর ইজ্জতহানি, লুণ্ঠন সহ চরম সন্ত্রাস চালাচ্ছে। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির সভাপতি লালমোহন টুডুকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে দেহ আটকে রেখেছে। তিনি বলেন, আজই আমাদের দলের শালবনি থানা সম্পাদক কমরেড কালীপদ মাহাতকে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। এইসব ঘটনার তদন্ত হচ্ছে না, দোষী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। ছত্রধর মাহাত, বিবেকানন্দ সাউ সহ শতাধিক মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ফলে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। 'মাওবাদী' দমনের নামে উভয় সরকার এলাকায় মধ্যযুগীয় নৃশংসতা চালাচ্ছে। অবিলম্বে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক দাবিগুলি মেনে নিতে হবে। কমরেড বসু বলেন, 'মাওবাদী'দের মধ্যে কিছু সৎ, সাহসী ও আবেগপ্রবণ ব্যক্তি থাকলেও ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহত্যা দ্বারা তাঁরা মাও সে তুঙের চিন্তাধারার বিরুদ্ধেই কাজ করছেন।

তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপ রুখতে লাগাতার আন্দোলন ছাড়া কোনও পথ নেই। দলের উদ্যোগে অসংখ্য গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ১৫ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র আধঘণ্টার প্রতীকী পথ অবরোধের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ের আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

নারীদিবসের শতবর্ষে দিল্লিতে সমাবেশ

একের পাতার পর

সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী। সমাবেশে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম — দেশের সকল প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মহিলা যোগ দেন। রামলীলা ময়দান থেকে সকাল ১১টায় মিছিল শুরু হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছায়।

বিকালে রামলীলা ময়দানে ডাঃ সুধা কামাথের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই চালাবার জন্য অঙ্গীকার নেওয়া দরকার। নারীমুক্তির এটাই একমাত্র পথ। তিনি আরও বলেন, আমার বয়স ৯৫ হয়েছে। আমি জীবিতকালেই দেখে যেতে চাই ভারতীয় নারীরা জীবনে স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে এস ইউ সি আই পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। কমরেড মানিক মুখার্জী আন্তর্জাতিক নারীদিবসের শতবর্ষে দিল্লির বুকে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার জন্য সংগঠকদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন, মর্যাদা ও সমাজে যথার্থ স্থানটি অধিকার করার জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা ও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নানা দিক তুলে ধরা হয়।

দিল্লির সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার (বাঁদিকে) এবং বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার

অবৈধ কয়লা খাদান, স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ রোধের দাবিতে পুরুলিয়ার সাঁতুড়িতে গণডেপুটেশন

পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি থানার বেশ কিছু অঞ্চলে প্রশাসনের যোগসাজশে কয়লা মাফিয়াচক্র দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কয়লা খাদানের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এলাকার গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজনদের এই সব খাদানে তারা স্বল্প মজুরিতে ও চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করে। এর ফলে সাধারণ মানুষ যেমন নিরুপায় হয়ে অনৈতিক জীবনযাপনের পথ অবলম্বন করছে, তেমনই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রায়ই কেউ না কেউ প্রাণ হারাচ্ছে। মৃত্যুতেও এরা মানবিক মর্যাদা পাচ্ছে না, ঘৃণ্য অপরাধী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকছে। তার উপর আছে বেআইনি কয়লা খাদানকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে থাকা দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। এলাকার মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ভয়াবহ দূষণে। পানীয় জল দূষিত হচ্ছে, চাষবাস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দূষণজনিত অসুখ বিসুখে ছেয়ে যাচ্ছে সমগ্র এলাকা। বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও অবস্থা যে কে সেই। ১৯ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে বেআইনি কয়লা খাদান ও স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের প্রতিবাদ জানাতে স্থানীয় মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল সাঁতুড়ি থানায় গিয়ে ও সি-কে স্মারকলিপি দেয়।

ঐ মিছিল পরে সাঁতুড়ি ব্লক অফিসে জমায়েত হয়ে ব্লক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। মিছিলে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল উল্লেখ করার মতো। নেতৃত্ব দেন সাঁতুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজিত মণ্ডল ও এলাকার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেডস কার্তিক মাজী ও মধু বক্সী। আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে দিশম পার্টির শ্রীমতী পানমণি বেসরা ও পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রী দিলীপ মণ্ডল ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সভা থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর অঙ্গীকার ঘোষিত হয়।

নন্দীগ্রামের সংগ্রাম

একের পাতার পর

আজ স্মরণ দিবসের তৃতীয় বর্ষে দাঁড়িয়ে জনগণকে বুঝতে হবে, সিপিএম কার স্বার্থে এই আক্রমণ চালাল। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি মাল্টিন্যাশনালদের সিপিএম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ওদের স্বার্থে সমস্ত পরিকল্পনা সরকার বিনা বাধায় কার্যকর করবে, কোনও আন্দোলন হতে দেবে না। মালিকদের কাছ থেকে এর বিনিময়েই সরকারে থাকার গ্যারান্টি পেয়েছে সিপিএম। এই পরিকল্পনাকে আন্দোলনের আঘাতে চুরমার করে দেওয়ার ক্ষেত্রে নন্দীগ্রাম ও পরে সিঙ্গুরের আন্দোলন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে।

দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে নির্যাতিত, স্বামী-পুত্র-স্ত্রী হারা মানুষ, ধর্ষিতা মা-বোনেরা ১৮ মাস ধরে লাগাতার আক্রমণের সামনেও মাথা নত করেননি। ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই এই শক্তি দিয়েছে। আক্রমণ যত বেড়েছে, প্রতিরোধের মনোবল যেন ততই দৃঢ় হয়েছে। সন্তানহারা পিতামাতা বলেছেন, এক সন্তান শহীদ হয়েছে, প্রয়োজনে আরও সন্তানকে এগিয়ে দেব; কিন্তু আন্দোলন ছাড়ব না। ধর্ষিতা হয়েও মা-বোনেরা মাথা উঁচু করে প্রতিবাদে প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছেন। শক্তি দিয়েছে, মর্যাদাবোধ দিয়েছে আন্দোলনই। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে, পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে, আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে জনগণ স্বকীয় উদ্যোগের জন্ম দিতে পেরেছেন।

সংগঠিত আন্দোলন শুধু দাবি আদায়েরই একমাত্র পথ নয়, আন্দোলনই একমাত্র মানুষকে চরিত্র দেয়, দৃঢ়তা দেয়, মর্যাদাময় জীবনের সন্ধান দেয়। অসংগঠিত যে মানুষ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অসহায় বোধ করে, সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে সেই মানুষই সাহসে- তেজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই তো নন্দীগ্রামের অজ্ঞাত অখ্যাত গরিব চাষি-মজুররা সমগ্র দেশের জনসাধারণের কাছে লড়াইয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের শহিদ স্মরণে কলকাতায় শহিদবেদিতে মাল্যদান করে সংগ্রামী অভিবাদন জানাচ্ছেন এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী

নাড়াজোলে লংকাচাষিদের পথ অবরোধ

২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের নাড়াজোল বাজারে মজুতদারদা লংকার দাম চক্রান্ত করে ১৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৮ টাকায় কেনার কথা ঘোষণা করলে লংকাচাষিরা মেদিনীপুরের ঘাটাল রাস্তা অবরোধ করেন। ঠিক ঐ সময় আলুর ন্যায্য দামের দাবিতে ক্ষীরপাইতে (ঘাটাল-মেদিনীপুর রাস্তা) অবরোধ চলছিল। চাষিদের সংগ্রামী মেজাজ দেখে ব্যবসায়ীরা ১৫ টাকায় লংকা কেনার প্রতিশ্রুতি দিলে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধে নিমাই দোলই ও বাপী কুইল্যা নেতৃত্ব দেন। দুটি অবরোধে প্রায় ৫০টির বেশি গ্রামের চাষিরা অংশগ্রহণ করেন।

বর্ধমানে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

সরকারি রেজিস্টারে বর্ধমান জেলায় ৩৯,৪৭০ জন বিড়ি শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হলেও বাস্তবে এই সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশি। এঁদের অধিকাংশেরই পরিচয়পত্র নেই, আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারগুলি থেকেও এঁরা বঞ্চিত, চিকিৎসার কোনও সুযোগ নেই।

সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি কালনায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন। গঠিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন স্বীকৃত বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in